# ॥ গল্প থেকে নাটক ॥

এইবার আমরা রূপগত পরিবর্তনের আলোচনায় প্রবেশ করছি। প্রথমেই আমাদের আলোচ্য গল্প থেকে নাটকে রূপান্তর। এই রকম পাঁচটি গল্প আমরা পাই, যেগুলি উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথ নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। ছোট গল্পের একাঙ্ক নাটকে রূপান্তর সহজ, কিন্তু তাকে পূর্ণাবয়ব-নাটক করতে গেলে অবশ্যই তাতে ঘটনা ও চরিত্রের বহুলতা-সম্পাদন প্রয়োজন হয়। কী ভাবে রবীন্দ্রনাথ গল্পগুলিকে পূর্ণ-দৈর্ঘ্য নাটকে রূপান্তরিত করেছেন, তা কৌতূহলপূর্ণ আলোচনার বিষয়।

মুকুট (১২৯২) নামক বড় গল্পটি এগারটি পরিচ্ছেদ এবং একটি পরিশিষ্টে বিভক্ত ছিল। মুকুট নাটকে (১৯০৮) আছে তিনটি অঙ্কে বিভক্ত বারটি দৃশ্য। নাট্যরূপে অনেক সময় মূল গল্পের একাধিক পরিচ্ছেদ একত্রিত করে একটি দৃশ্য রচিত হয়েছে। যেমন প্রথম তিন পরিচ্ছেদ মিলিয়ে ১।১ দৃশ্য। মুকুট নাটক বিষয়ে নাট্যকার জানিয়েছেন—"বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের বালকদের দ্বারা অভিনীত হইবার উদ্দেশে বালক পত্রে প্রকাশিত মুকুট-নামক ক্ষুদ্র উপন্যাস হইতে নাট্যীকৃত।"[১] বালকদের দ্বারা অভিনেতব্য বলেই গল্পে যে নারীচরিত্র ছিল, ইন্দ্রকুমারের স্ত্রী কমলাদেবী, নাটকে সেটি পরিত্যক্ত। সঙ্গে-সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একটি বিদূষক চরিত্র—রাজধরের বয়স্য তার 'মামাতো ভাই' ধুরন্ধর।

মুকুট গল্পের নাট্যরূপান্তর সম্বন্ধে রবীন্দ্রজীবনীকার বলেছেন, "মুকুট গল্প ও নাটকের মধ্যে পটভূমিকা ও কাহিনীর বিন্যাসে কোনো পার্থক্য নাই, শুধু শেষ দৃশ্যের প্রয়োজনীয় পরিবর্তনটুকু ছাড়া। গল্প যেখানে শুধুই ট্র্যাজেডি, নাটকটি সেখানে নাটকীয় কারণেই মিলনান্তক। এই পরিবর্তনে দুই কাহিনীর অন্যতম নায়ক রাজধরের চরিত্রেও কিছুটা সংস্কার ও রূপান্তর আনিয়া দিয়াছে।"[২] গল্পে ছিল মৃত্যুর পরম্পরা—যার জন্য দায়ী রাজধরের প্রতিহিংসামূলক বিশ্বাসঘাতকতা। নাটকের পরিণাম অন্য রকম। রাগের বশবর্তী হয়ে দাদাকে ছেড়ে গিয়েছিল বলে মুমূর্ষু চন্দ্রনারায়ণের কাছে ইন্দ্রকুমার যখন ক্ষমা চাইছে তখন রাজধর প্রবেশ করে কৌশলার্জিত মুকু যুবরাজের পদপ্রান্তে রাখে। যুবরাজের নির্দেশে সে মুকুট দেয় ইন্দ্রকুমারকে, ইন্দ্রকুমার সেই মুকুট পরিয়ে দেয় রাজধরকেই। মানতেই হবে এই পরিণাম ভাবালুতাময়। তার চেয়েও বড়ো আপত্তি, রাজধরের এই আচরণ পূর্বপ্রস্তুতিহীন। বড় দাদার জন্য তার খানিকটা দুর্বলতার ইঙ্গিত থাকলেও, রাজধরের চরিত্রের যথেষ্ট 'সংস্কার ও রূপান্তর' করা হয় নি, যাতে তার অনুতাপ বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠতে পারে।

শেষের রাত্রি (১৩২১) থেকে গৃহপ্রবেশে (১৯২৫) রূপান্তর আলোচনা করলে এই পরিবর্তনের স্বরূপ আরো সুস্পষ্ট হবে। গল্পটি এমনই সংলাপপ্রধান ও বর্ণনাবর্জিত যে গল্পটিকে একটি নাটিকাই বলা চলে। তাই এই গল্পের নাট্যরূপান্তর এমন সহজ হয়েছে। গল্পের মধ্যে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশবিভাগগুলি আছে তাকে মাত্র ঘটনা-চরিত্র ও সংলাপের বহুলতার দ্বারা পূর্ণাঙ্গ এক একটি নাটকীয় দৃশ্যে রূপান্তরিত করা হয়েছে। শেষের রাত্রিতে বাউলের একটি গানের কথা যতীনের মনে পড়েছিল। গৃহপ্রবেশে হিমির মুখে রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি গান বসিয়েছেন। এই হিমি এবং অখিল সম্পূর্ণ নূতন চরিত্র। সুতরাং হিমির প্রতি অখিলের আসক্তি, বাড়িবন্ধকের ব্যাপারে অখিলের চক্রান্ত সম্পূর্ণ নূতন উপাদান, সেগুলি গল্পে স্বভাবতই অনুপস্থিত ছিল। পাটের ব্যবসায় সংক্রান্ত কথাবার্তাও নূতন এসেছে—নাটকের পিছনে যে বাস্তবজীবনযাত্রা তারই দ্যোতনার উদ্দেশ্যে। ডাক্তারচরিত্র ও প্রতিবেশিনীরা প্রাধান্য পেয়েছে পূর্ণাঙ্গ নাটক গড়ে তোলার প্রয়োজনে। এই চরিত্রগুলির উপস্থিতির সুযোগে রবীন্দ্রনাথ মণি ও মাসির সম্বন্ধে বাইরের লোকের ধারণা ও প্রতিক্রিয়া অনেক বেশী স্পষ্ট করে তুলতে পেরেছেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীনীহাররঞ্জন রায়ের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—"মণিচরিত্রের কল্পনা একটু অস্বাভাবিক, কিন্তু শেষের রাত্রিতে সে-অস্বাভাবিকত্বটুকু প্রায় চোখেই পড়ে না ; সুরাবেগে উচ্ছ্বসিত গীতধর্মী গল্পে তাহা ধরা পড়িবার কথাও নয় ; কিন্তু নাটক, বিশেষভাবে পরিবার বা সমাজের আবেষ্টনে যে নাটকের গড়ন তাহাতে বস্তুনিষ্ঠা না থাকিলে দৃশ্যগত নাটক শিথিলমূল হইয়া পড়ে। গৃহপ্রবেশে সেই শিথিলতা ধরা পড়িয়া যায়, মণির অস্বাভাবিকত্ব প্রকট হইয়া উঠে ; পাটের বাজারের উল্লেখ কিংবা অখিলের মতো সাংসারিক চরিত্রের অবতারণা সত্ত্বেও গৃহপ্রবেশ দর্শকচিত্তে যথেষ্ট বস্তুসচেতন সঞ্চার করে না।"[৩] বস্তুভিত্তির শিথিলতা সম্বন্ধে এই মন্তব্য মানতেই হয়, কিন্তু এই উদ্ধৃতিতে সম্ভবত গৃহপ্রবেশের মণিচরিত্রের প্রতি অবিচার করা হয়েছে। গল্পে মণি ছিল শুধুই নিষ্ঠুর এবং সেই নিষ্ঠুরতা ছিল অনেক পরিমাণে অব্যাখ্যাত। কিন্তু নাটকে মণির আচরণ অনেক বেশি সংগত। এখন তাকে তত নিষ্ঠুর মনে হয় না, যত মনে হয় তার নারীত্ব অজাগ্রত এবং বেদনাবোধের অভাবে সে অপূর্ণ। নাটকে তাই মণির প্রতি অবিচার কম।

শেষের রাত্রির অনেক সংলাপ ভেঙে, বিস্তারিত করে, রূপান্তরিত করে নাটকে ব্যবহার করেছেন। যেমন, পিত্রালয়ে যাবার প্রস্তাব নিয়ে মণি ও মাসির সংলাপ, উইল সম্পর্কে মাসি ও যতীনের কথা, মাসি যেখানে মেয়ে হয়ে জন্মানো বিষয়ে উক্তি করেছে সেখানকার সংলাপ। অধিকাংশ সংলাপ স্বভাবতই সম্পূর্ণ নূতন রচনা কিন্তু যেখানে গল্পের সংলাপ প্রায় অবিকৃত রেখে নাটকে ব্যবহার করা হয়েছে তার রূপান্তরের একটি উদাহরণ উল্লেখ করা যেতে পারে।

শেষের রাত্রি

"বউ, তোমার বাপের বাড়ির থেকে কিছু খবর এসেছে বুঝি? তোমার জাঠতুতো ভাই অনাথকে দেখলুম যেন।'

"হাঁ, মা বলে পাঠিয়েছেন, আসছে শুক্রবারে আমার ছোটো বোনের অন্নপ্রাশন। তাই ভাবছি—"

"বেশ তো বাছা, একগাছি সোনার হার পাঠিয়ে দাও, তোমার মা খুশি হবেন।"

"ভাবছি আমি যাবো। আমার ছোটো বোনকে তো দেখি নি, দেখতে ইচ্ছে করে।"

"সে কী কথা, যতীনকে একলা ফেলে যাবে? ডাক্তার কী বলেছে শুনেছো তো?

"ডাক্তার তো বলছিল, এখনো তেমন বিশেষ—"

"তা যাই বলুক, ওর এই দশা দেখে যাবে কী করে।"

"আমার তিন ভাইয়ের পরে এই একটি বোন, বড়ো আদরের মেয়ে—শুনেছি, ধুম করে অন্নপ্রাশন হবে—আমি না গেলে মা ভারি—"

"তোমার মায়ের ভাব, বাছা, আমি বুঝতে পারি নে। কিন্তু যতীনের এই সময়ে তুমি যদি যাও, তোমার বাবা রাগ করবেন, সে আমি বলে রাখছি।"

"তা জানি। তোমাকে এক লাইন লিখে দিতে হবে, মাসি, যে, কোনো ভাবনার কথা নেই—আমি গেলে বিশেষ কোনো—"

"তুমি গেলে কোনো ক্ষতিই নেই সে কি আমি জানি নে। কিন্তু তোমার বাপকে যদি লিখতেই হয়, আমার মনে যা আছে সব খুলেই লিখব।"

গৃহপ্রবেশ

( প্রায় অবিকৃত প্রথম অংশের পরে )

মাসি ॥ ও মা, সে কী কথা। যতীনকে একলা ফেলে যাবে?

মণি ॥ ফিরতে আমার খুব বেশি দেরি হবে না।

মাসি ॥ খুব বেশি দেরি হবে কি না তা কে বলতে পারে, মা। সময় কি আমাদের হাতে। চোখের এক পলকে দেরি হয়ে যায়।

মণি ॥ তিন ভাইয়ের পরে বড়ো আদরের মেয়ে, ধুম করে অন্নপ্রাশন হবে। আমি না গেলে মা ভারি—

মাসি ॥ তোমার মায়ের ভাব, বাছা, বুঝতে পারি নে—কান্নার সাতসমুদ্রে ঘেরা যাদের প্রাণ তোমার মাও তো সেই মায়েরই জাত, তবু তিনি মানুষের এত বড়ো ব্যথা বোঝেন না, ঘন ঘন কেবলই তোমাকে ডেকে ডেকে নিয়ে যান—

মণি ॥ দেখো মাসি, তুমি আমার মাকে খোঁটা দিয়ে কথা কয়ো না বলছি। তবু যদি আপন শাশুড়ি হতে, তা হলেও না হয় সহ্য করতুম, কিন্তু—

মাসি ॥ আচ্ছা মণি, অপরাধ হয়েছে, আমাকে মাপ করো। আমি শাশুড়ি হয়ে তোমাকে কিছু বলছি না, আমি একজন সামান্য মেয়েমানুষের মতোই মিনতি করছি—যতীনের এই সময়ে তুমি যেয়ো না। যদি যাও তোমার বাবা রাগ করবেন, সে আমি নিশ্চয় জানি।

মণি ॥ তা জানি, তোমাকে এক লাইন লিখে দিতে হবে, মাসি। এই কথা বোলো যে, আমি গেলে বিশেষ কোনো—

মাসি ॥ তুমি গেলে কোনো ক্ষতিই নেই, সে কি আমি জানি নে। কিন্তু তোমার বাপকে যদি লিখতে হয়, আমার মনে যা আছে খুলেই লিখব। (১)

এই রূপান্তর পর্যালোচনা করলে দেখি, প্রথমত 'ডাক্তার কী বলেছে শুনেছো তো?' এই জাতীয় একটি-দুটি বাক্য বর্জিত হয়েছে; দ্বিতীয়ত, নাটকের অভিনয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে উচ্চারণসৌকর্যের জন্য 'তোমাকে এক লাইন লিখে দিতে হবে, মাসি, যে, কোনো ভাবনার কথা নেই—আমি গেলে বিশেষ কোনো—'সংলাপটিকে সুস্পষ্টভাবে দুইটি বাক্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে এবং জড়তামুক্তির প্রয়োজনে একটি বাক্যাংশকে বর্জন করা হয়েছে। তৃতীয়ত, প্রচলিত সহজ ভাষার মধ্যে এসেছে এক মুহূর্তে কবিত্বের স্পর্শ বেদনার গভীরতায়—'কান্নার সাতসমুদ্রে ঘেরা যাদের প্রাণ।' বহু ক্ষেত্রে মূল রচনার সংলাপ অংশকে বিস্তারিত করতে হয়েছে পূর্ণ দৈর্ঘ্য নাটকের প্রয়োজনে। সংলাপগত পরিবর্তনের ফলে চরিত্রগত পরিবর্তনের আভাসও লক্ষিত হয়। গল্পের মণির মত নাটকের মণি অত সংকোচদ্বিধাগ্রস্ত নয়, মণি নিজের অধিকার সম্বন্ধেও নাটকে বেশি সচেতন, মাসির প্রতি মণির বিরুদ্ধ মনোভাব নাটকে যত নগ্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে তেমনভাবে গল্পে প্রকাশ পায় নি। গল্পে মাসি নিষেধ করেছে, নাটকে মাসি মিনতি করেছে। সুতরাং বলা যায় সংলাপের পরিবর্তন চরিত্র-পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করছে।

নাটকের কোন কোন জায়গায় সংলাপ প্রায় অবিকৃতভাবে গল্প থেকে গ্রহণ করায় কী জাতীয় অন্যমনস্কতার চিহ্ন রয়ে গেছে তার একটি উদাহরণ এই প্রসঙ্গে দিই। নাটকের প্রথম অঙ্কে, যেখানে ডাক্তারের সঙ্গে যতীনের কথোপকথন সম্পূর্ণ নূতন রচনা সেখানে

যতীনের বাবার 'ক্লাসফ্রেণ্ড' ডাক্তার যতীনকে 'তুমি' বলেছে এবং যতীন ডাক্তারকে 'আপনি' বলেছে। কিন্তু নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে যেখানে মৃত্যুর পূর্বাহ্নে ডাক্তারের সঙ্গে যতীনের কথোপকথন গল্প থেকে প্রায় অবিকৃতভাবে গ্রহণ করা হয়েছে—

শেষের রাত্রি

"দেখুন, আপনি (মাসি) ওঁর কাছে থাকলে উনি (যতীন) বড়ো বেশি কথা কন।"

গৃহপ্রবেশ

ডাক্তার ॥ আপনি (মাসি) ওঁর (যতীন) কাছে থাকবেন না—আপনার সঙ্গে বড়ো বেশি কথা কন—। (২)

কিংবা ঠিক তার পরেই—

শেষের রাত্রি

"তা হলে তোমরা (ডাক্তার ইত্যাদি) যাও, আমাকে উত্তেজিত কোরো না।"

গৃহপ্রবেশ

ডাক্তার ॥ এতটা উত্তেজনা ভালো হচ্ছে না।

যতীন ॥ তবে আমাকে আর উত্তেজিত কোরো না। (২)

সেখানে রবীন্দ্রনাথ অন্যমনস্ক হয়ে, আগেকার সংলাপ প্রায় অবিকৃত রেখেছেন বলে নাটকে-কৃত পূর্বের পরিবর্তন ভুলে, যতীনকে দিয়ে 'তুমি' এবং ডাক্তারকে দিয়ে 'আপনি' বলিয়েছেন।

গল্প ও নাটকের শেষে একইভাবে মণির প্রত্যাবর্তন। সংলাপ দুই ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ এক। কিন্তু গল্পে ব্যাপারটি মাসির স্তোক বলে এবং যতীনের মৃত্যুমুখী আচ্ছন্নতা বলে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে ('কে এসেছে। স্বপ্ন?'), যদিও 'শ্বশুর এসেছেন' বলায় মণির প্রত্যাবর্তন বাস্তব প্রত্যাবর্তন বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু নাটকে 'মণির প্রবেশ' তিলেক সন্দেহও অবশিষ্ট রাখে না। অথচ মণির এই প্রবেশ তার পরিবর্তন সূচনা করে কিনা, নারীত্বের জাগরণ সূচনা করে কিনা, কোন ক্ষেত্রেই তা বোঝার উপায় নেই। পায়ের উপর পড়া প্রথার প্রতি আনুগত্য, না আন্তরিক পরিবর্তনের সূচনা, আমরা জানি না। 'দরজাটা কি সব খুলে গিয়েছে', যতীনের এই উক্তির সঙ্গে শেষের রাত্রি নামকরণ সংগত ছিল না, গৃহপ্রবেশ নামকরণ অনেক বেশি সংগত হয়েছে। গৃহপ্রবেশ নামের সার্থকতার দরুণ মণি এবং গৃহ দুই-ই সমান মর্যাদা পেয়েছে, গল্পে মণিই প্রধান এবং এই সার্থক নামকরণের ফলে মৃত্যু যে শেষের রাত্রি নয়, সে যে মহত্তর গৃহপ্রবেশের ভূমিকা তারও ইঙ্গিত করা হয়েছে।

কর্মফল (১৩১০) গল্পটি নাটকাকারেই লেখা। বর্ণনা নেই, শুধু পাত্র-পাত্রীর সংলাপের মধ্য দিয়ে গল্পের অগ্রগতি হয়েছে। নাটকেরই মতো গল্পটিতে পাত্র-পাত্রীর প্রবেশ-প্রস্থান নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নাটকের ধরণের লেখা বলে গল্পে যে পরিচ্ছেদের বিভাগ করা হয়েছে সেগুলি বস্তুত দৃশ্যেরই বিভাগ। তাই কর্মফল গল্পটিকে শোধবোধে (১৯২৬) পূর্ণাঙ্গ নাটকের রূপ দিতে রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ কোন বেগ পেতে হয় নি, বিশেষ কোন পরিবর্তন করতে হয় নি। নলিনীর বন্ধুরূপে নাটকে চারুবালা স্থান পেয়েছে, নন্দী কিঞ্চিৎ অধিক প্রাধান্য পেয়েছে এবং নন্দী-চারুবালা-নলিনী ও নলিনীর পিতামাতার কথোপকথনের মধ্য দিয়ে তথাকথিত সোসাইটির অন্তঃসারশূন্যতা গল্পের থেকে আরো বেশী প্রখরভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। ভাদুড়ি পরিবার নাটকে লাহিড়ি পরিবার হয়েছে। নাটকের প্রথম দৃশ্যে নলিনীর জন্মদিনোৎসব-বিবরণ সম্পূর্ণ নূতন রচনা। সোনার গুড়গুড়ির ব্যাপার, নলিনী কর্তৃক স্পষ্টভাবে নন্দীকে প্রত্যাখ্যান, নন্দী-চারুবালার নূতন সম্পর্ক, নাটকের এই উপাখ্যানগুলির বীজ গল্পে ছিল না। এগুলি নূতন উপাদান। অন্য দৃশ্যগুলি, গল্পের পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদ যোগ করে সামান্য কিছু পরিবর্তন ও কিঞ্চিৎ পরিমাণ সম্প্রসারণের দ্বারা রচিত। গল্পের কয়েকটি পরিচ্ছেদকে যুক্ত করে নাটকের একটি দৃশ্য রচনার প্রয়োজনে নাটকে আমরা এত বারবার পাত্র-পাত্রীর প্রবেশ ও প্রস্থান পাই। চতুর্থ ও পঞ্চম দৃশ্য গল্পের একাদশ থেকে অষ্টাদশ পরিচ্ছেদের সম্পূর্ণ আনুগত্যে রচিত। উল্লেখযোগ্য কোন যোগের প্রয়োজনীয়তা পর্যন্ত দেখা যায় নি। নিজ সমাজের অন্তঃসারশূন্যতার প্রতি নলিনীর ঘৃণা শোধবোধ নাটকে তীব্রভাবে প্রকট। কিন্তু কর্মফল গল্পেও সেই মনোভাব কম স্পষ্ট নয়।

'একটি আষাঢ়ে গল্পে' (১২৯৯) সেই তাসের রাজ্যের কথা পাই যেখানে 'চমৎকার শৃঙ্খলা'। কিন্তু 'বিদেশ হইতে তিনটে জীবন্ত দৃষ্টান্ত' এসে সব ওলটপালট করে দিল—হরতনের বিবি নারী হয়ে উঠল রাজপুত্রের প্রতি প্রেমে। হরতনের বিবির সঙ্গে রাজপুত্রের প্রণয় পরিণামে বিবাহসিদ্ধি পেল, তারা হলো তাসের দেশের রাজা ও রাণী। 'ছবির দল হঠাৎ মানুষ হইয়া উঠিয়াছে।' এই গল্পের মূল ভিত্তি অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ নৃত্যগীত সম্বলিত তাসের দেশ (১৯৩৩) নাটক রচনা করেছিলেন। এখানে রূপান্তর শুধু নয়, যেন

জন্মান্তর ঘটেছে। নবরূপে শুধু নির্জীবতা নিন্দিত এবং প্রাণ বন্দিত হয় নি, এখানে প্রাসঙ্গিক আরো নানা বিষয়ে ব্যঙ্গ-পরিহাস করা হয়েছে। হরতনের বিবির সঙ্গে রাজপুত্রের প্রণয় এবং পরিণয়ের মধ্য দিয়ে গল্পের যে সুন্দর সমাপ্তি ছিল, তাসের দেশে সেই মাধুর্য নেই। তাসরাজ্যের প্রজাসাধারণের দলবদ্ধ মুক্তির মধ্যে সেই মাধুর্য নেই, যে মাধুর্য ছিল একজনের হৃদয়ে প্রেমের মধ্য দিয়ে প্রাণের আবির্ভাবে। ফলে, গল্পে যা অনুপস্থিত ছিল, সেই তীব্রধার ব্যঙ্গ বা স্যাটায়ারধর্মই নাটকে প্রাধান্য পেয়েছে। এখানে প্রসঙ্গত বংশমর্যাদা, প্রায়শ্চিত্ত-বিধি, সংস্কারনিয়ম, শাস্ত্রমতে জাতির উৎপত্তি-বিবরণ, খবরের কাগুজে ভাষা, রাষ্ট্রের বাধ্যতামূলক আইন ইত্যাদিকে বিদ্রূপ করা হয়েছে। গল্পে যা ইশারায় ছিল, যেমন তাসিনীদের ঈর্ষা, নাটকের বৃহত্তর পরিসরে তা বিস্তারিত। গল্পে স্বভাবতই গান যোগের কোন সুযোগ ছিল না—নাটকে গানগুলি নূতন যুক্ত হয়েছে। .এই গানগুলির ভাষা-বৈচিত্র্য এবং ভাবের সঙ্গে ভাষা ও সুরের সহধর্মিতা লক্ষণীয়।

এই বিদ্রূপাত্মক নৃত্যগীতময় নাট্যের প্রেরণা রবীন্দ্রনাথ কোথায় পেয়েছিলেন তা বোঝা যায় তাঁর যাত্রী গ্রন্থের জাভাযাত্রীর পত্র পড়লে। একটি উদ্ধৃতি দিই—"কাল রাত্রে আমাদের এখানেও একটা নাচ হয়ে গেল। পূর্ব রাত্রে যে দুইজন বালিকা নেচেছিল, তাদের মধ্যে একজন আজ পুরুষ-সঙের মুখোষ পরে সঙের নাচ্ নাচলে। আশ্চর্য ব্যাপারটা হচ্ছে ওর মধ্যে নাচের শ্রী সম্পূর্ণ রক্ষা করেও ভাবে ভঙ্গীতে গলার আওয়াজে পুরোমাত্রায় বিদূষকতা করে গেল। পুরুষের মুখোষের সঙ্গে তার অভিনয়ের কিছুমাত্র অসামঞ্জস্য হলো না।···নাচের শোভনতাকে বিকৃত না করেও যে তার মধ্যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের রস এমন করে আনা যেতে পারে এ আমার কাছে আশ্চর্য ঠেকল।"[৪] লক্ষ্য করার বিষয় রবীন্দ্রনাথ এই নাটকে শুধু মুখোষব্যবহারের সাহায্যে নাট্যরস পরিবেশন করেছেন তা নয়, জাভায় যেমন নৃত্যের শিল্পগুণ অক্ষুণ্ণ রেখে ব্যঙ্গবিদ্রূপ-পরিহাসের রস পরিবেশনের দৃষ্টান্ত দেখেছিলেন, এখানে তেমনি কথা-সুর-নৃত্যের সমবায়ে শিল্পের শোভনতা বজায় রেখে তিনি সেই বিদূষকতার রস তাসের দেশে প্রবাহিত করেছেন। আরো একটি উদ্ধৃতি দিলে তাসের দেশের প্রেরণা যে তিনি দ্বীপময় ভারতে অর্জন করেছিলেন সে কথা স্পষ্ট হয়ে যাবে। "সেই সন্ধ্যাবেলাতেই রাজবাড়িতে আর একটি ব্যাপার দেখলুম, মুখোষ পরা নটেদের অভিনয়।···আমাদের সকলেরই মুখে যেমন ব্যক্তিগত তেমনি শ্রেণীগত বিশেষত্ব আছে। বিশেষ ছাঁচ ও ভাবপ্রকাশ অনুসারে আমাদের মুখের ছাঁদ এক এক রকম শ্রেণী নির্দেশ করে। মুখোষ তৈরি যে গুণী করে সে সেই শ্রেণী-প্রকৃতিকে মুখোষে বেঁধে দেয়। সেই বিশেষ শ্রেণীর মুখের ভাববৈচিত্র্যকে একটি বিশেষ ছাঁদে সে সংহত করে। নট সেই মুখোষ পরে এলে আমরা তখনই দেখতে পাই একটা বিশেষ মানুষকে কেবল নয়, বিশেষভাবের এক শ্রেণীর মানুষকে। সাধারণত অভিনেতা ভাব-অনুসারে অঙ্গভঙ্গী করে। কিন্তু মুখোষে মুখের ভঙ্গী স্থির করে বেঁধে দিয়েছে। এইজন্য অভিনেতার কাজ হচ্ছে মুখোষেরই সামঞ্জস্য রেখে অঙ্গভঙ্গী করা।"[৫] তাই রবীন্দ্রনাথ তাসের দেশের গানগুলিতে এমন সুরারোপ করেছেন যাতে তাসের মুখোষ পরে অভিনেতা-অভিনেত্রীর পক্ষে সামঞ্জস্যপূর্ণ অঙ্গভঙ্গী করা সম্ভব হয়। মুখোষের স্থির ভাবটির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নৃত্য ও অঙ্গচালনা করার জন্যই তাসের দেশের গানে ঐ জাতীয় সুরারোপ করা হয়েছে। সুরের বিশেষত্বের দ্বিতীয় কারণ, পরিহাসের পরিবেশন, শুধু কথার মাধ্যমে নয়, সুরেরও মাধ্যমে। এই তাসের দেশে রাজপুত্র এবং তার বন্ধুরাই একমাত্র ব্যক্তি, এই দেশের আদি বাসিন্দারা সবাই নিতান্ত শ্রেণীগত মানুষ—ছক্কাপাঞ্জার দল। তাই শ্রেণী বোঝানোর জন্য তাদেরই মুখে মুখোষ আঁটা। ভাববিকারহীন সেই মুখোষ পরে তারা সুশৃঙ্খল জীবন যাপন করে। যে দেশের লোক মেপে অঙ্গচালনা করে, নিয়মে ওঠে নিয়মে বসে, তাদের মুখে মুখোষ এঁটে রবীন্দ্রনাথ জাভার মুখোষনাট্য দেখার অভিজ্ঞতাকে চমৎকারভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন। যারা নিতান্ত শ্রেণীগত মানুষ রাজপুত্রের প্রভাবে তারা হলো ব্যক্তিমানুষ—প্রকাশিত হলো তাদের 'ইচ্ছে'-শক্তি। মুখোষের বিকারহীনতা ঘুচে মুখে এখন ভাববিকারের ছায়া পড়ল।

মুক্তির উপায় (১২৯৮) গল্পের 'ফকিরচাঁদ বাল্যকাল হইতেই গম্ভীরপ্রকৃতি'—ধর্মচর্চায় নিবিষ্টমন। কিন্তু গল্পে কোনো গুরুর কথা ছিল না। মুক্তির উপায় নাটকে (১৩৪৫) স্বর্ণলুব্ধ এক গুরুর কবলে তার ধনসম্পত্তি লোপের উপক্রম শুধু নয়, সেই গুরু নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যে সশরীরে উপস্থিত। এই গুরুর সাদৃশ্য পরশুরামের বিরিঞ্চিবাবার সঙ্গে, তার পরিণতিও একই রকম।[৬] গল্পে নায়িকা ছিল ফকির-চাঁদের স্ত্রী হৈমবতী।

> 'স্ত্রী হৈমবতীর বয়স অল্প এবং তাহার মন পার্থিব বিষয়ে সম্পূর্ণ নিবিষ্ট। সে বঙ্কিমবাবুর নভেল পড়িতে চায় এবং স্বামীকে ঠিক দেবতার ভাবে পূজা করিয়া তাহার তৃপ্তি হয় না। সে একটুখানি হাসিখুশি ভালোবাসে, এবং বিকচোন্মুখ পুষ্প যেমন বায়ুর আন্দোলন এবং প্রভাতের আলোকের জন্য ব্যাকুল হয় সেও তেমনি এই নবযৌবনের সময় স্বামীর নিকট হইতে আদর এবং হাস্যামোদ যথাপরিমাণে প্রত্যাশা করিয়া থাকে।'

নাটকে হৈম প্রচ্ছন্ন, প্রায় অন্তরালবর্তিনী। সে এখন পুষ্প-র 'পাড়াগেঁয়ে বোনমাত্র।'[৭]

নাটকে নায়িকার স্থান পেয়েছে হৈম-র দূরসম্পর্কিত দিদি পুষ্পমালা 'এম, এ, পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়া মেয়ে।' হাস্যকৌতুকে উজ্জ্বল এই মেয়ের সাদৃশ্য শেষের কবিতা-পরবর্তী রবীন্দ্রনাথের শহুরে নায়িকাদের সঙ্গে, বাঁশরি সরকারদের সঙ্গে। সে বঙ্কিমের নভেল পড়ে না, কথায়-কথায় রবিঠাকুর কোট্ করে। চতুর্দিকে স্বামীরা ঘর ছেড়ে পালাচ্ছে দেখে বিব্রত ষষ্ঠীচরণ যখন জজ্ঞাসা করে, 'কনগ্রেসওয়ালারা এর কিছু করে উঠতে পারলে না?' উত্তরে পুষ্প বলে,

> 'মহাত্মাজিকে বললে এখনি তিনি মেয়েদের লাগিয়ে দেবেন অসহযোগ আন্দোলনে। দেশে হাতাবেড়ির আওয়াজ একেবারে বন্ধ। গলির মোড়ে খুদু ময়রার দোকানে তেলে-ভাজা ফুলুরি খেয়ে বাবুদের আপিসে ছুটতে হবে—দুদিন বাদেই সিক্ লীভের দরখাস্ত। (৩)

এই প্রসঙ্গে প্রভাতকুমারের উক্তিকে সমর্থনে উদ্ধৃত করা যায়—"পুষ্পমালার ন্যায় মেয়ে সমাজে দেখা যায় কিনা জানি না, এক হিসাবে কন্যাটি অতি প্রগলভা—high-brow বা নাক-উঁচু অপবাদও দেওয়া যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ যখন মূল গল্পটি লেখেন সাতচল্লিশ বৎসর পূর্বে তখন এই শ্রেণীর নায়িকার কল্পনা তাঁহার সাহিত্যে দেখা যায় কম। সবুজপত্র-উত্তর পর্ব হইতে এই শ্রেণীর নায়িকা তাঁহার গল্প মধ্যে প্রায়ই দেখা যাইতেছে। পুষ্পমালা হইতেছে লাবণ্য, কেতকী, সরলাদের সমগোষ্ঠীগত নব্যশিক্ষিতা নারী—এমন কি ইহারা গোরা-র নারীও নহে। কবিজীবনের পরিবেশের পরিবর্তন হইয়াছে—এখনকার নায়িকাদের অনেকেই ধনীকন্যা, ড্রয়িংরুম-বিহারিণী, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারিণী এমন কি বিলাতফেরৎ রমণী।"[৮] সরল কৌতুকময় পুরোনো গল্পের ঘাড়ে সাতচল্লিশ বছর পরের পরিবেশ থেকে নব্যশিক্ষিত বাক্‌পটু রমণীকে চাপিয়ে দেওয়া খুব সুখের হয় নি। পাড়া-গাঁর পরিবেশে পুষ্প যেমন বে-মানান, এই সরল নাটকের মধ্যেও তেমনি সে বেমানান। মাঝখান থেকে এই চরিত্রের প্রভাবে আগের সাবলীল অকৃত্রিমতা অনেকটাই ক্ষুণ্ণ হয়েছে। শুধু পুষ্পের কথায় নয়, তার দেখাদেখি অন্যদের কথায়ও এসেছে এক ধরণের কৃত্রিম স্পার্টনেসের ছোঁয়া। এ ছাড়া সময়ের পরিবর্তনে অনেক সম-সাময়িক উল্লেখ-অনুষঙ্গ নাটকে ঢুকেছে। পূর্ণাঙ্গ নাটক করতে গিয়ে বলদেও-প্রভৃতি নতুন চরিত্র আনতে হয়েছে। কিন্তু যে মাখনলাল গল্পে ছিল ষষ্ঠীচরণের ছেলে, সে নাটকে হঠাৎ কেন ষষ্ঠীচরণের নাতি হয়ে গেল বোঝা যায় না!

১ রবীন্দ্ররচনাবলী ৬ (প, ব, স) পৃঃ ২১৯
২ রবীন্দ্রজীবনী ২ (বি, ভা) ১৩৬৮, পৃঃ ১৯৮
৩ রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা (পঞ্চম সং)—নীহাররঞ্জন রায়, ১৩৬৯, পৃঃ ৩৩৪
৪ যাত্রী (বিশ্বভারতী) ১৩৫৩, পৃঃ ২৮৪
৫ তদেব, পৃঃ ২৫৬
৬ এই সাদৃশ্য প্রভাতকুমারেরও চোখে পড়েছে। রবীন্দ্রজীবনী ৪, ১৩৬৩, পৃঃ ১৪৩ দ্রষ্টব্য।
৭ ভূমিকা, রবীন্দ্র রচনাবলী ৬, (প, ব, স) পৃঃ ১২৩৫
৮ রবীন্দ্রজীবনী ৪, ১৩৬৩, পৃঃ ১৪৩

## ॥ উপন্যাসের নাট্যরূপান্তর ॥

আমরা রবীন্দ্রনাথের এমন কতকগুলি নাটক পাই যেখানে রবীন্দ্রনাথ নিজের উপন্যাস থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে নাটক রচনা করেছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি নাট্যরূপান্তরকালে সমগ্র উপন্যাসকেই ব্যবহার করেছেন—যেমন বউঠাকুরাণীর হাট ও প্রজাপতির নির্বন্ধ উপন্যাসের ক্ষেত্রে। আবার কখনো এইরূপ রূপান্তরের সময় উপন্যাসের অংশবিশেষকে গ্রহণ করেছেন, যেমন রাজর্ষি উপন্যাসের ক্ষেত্রে।

### (ক) বউঠাকুরাণীর হাট (১৮৮৩) ঃ প্রায়শ্চিত্ত (১৯০৯)

বউঠাকুরাণীর হাট উপন্যাসটির কাহিনী রবীন্দ্রনাথ নিয়েছেন প্রতাপচন্দ্র ঘোষের বঙ্গাধিপ-পরাজয় গ্রন্থ থেকে। এই উপন্যাসটির বিচিত্র নাট্যরূপান্তরের ইতিহাস আছে। উপন্যাস থেকে প্রায়শ্চিত্ত নাটক, তার থেকে এক বিশিষ্টধরণের রূপান্তর মুক্তধারা, অন্যধরণের রূপান্তর পরিত্রাণ। এ ছাড়া, জানা যায়, রবীন্দ্রনাথের বউঠাকুরাণীর হাট অবলম্বনে লিখিত কেদারনাথ চৌধুরীর রাজা বসন্ত রায় নাটক জনপ্রিয়তার সঙ্গে রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছিল। সেই পরবর্তী বিবর্তনের ইতিহাসের আলোচনা আপাতত স্থগিত রেখে, রবীন্দ্রনাথ